গজনীর তুর্কীদের ভারত অভিযান

উপাদান — ফারুখি এর দিওয়ান।
আলবেরুনীর তহকিক-ই-হিন্দ।

* তুর্কীনেতা আলপ্তিগীন আনুমানিক 962 খ্রিঃ আফগানিস্তানের গজনীকে কেন্দ্র করে একটি (ছোট রাজ্য) গড়ে তোলেন।

* আলপ্তিগীনের জামাতা সবুক্তগীন 977 খ্রিঃ গজনীর সিংহাসনে বসেন এবং তখন থেকেই গজনী রাজ্যের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তিনি গজনীতে ইয়ামিনি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, যা সাধারণভাবে গজনাভিদ বংশ নামে পরিচিত।

সুলতান মামুদ (997- 1030 খ্রিঃ)

* ইয়ামিনি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান।

মামুদ 1000- 1027 খ্রিঃ 26 বছরে 17 বার ভারত আক্রমন করেন।

গুরুত্বপূর্ন ভারত অভিযান

(i) 1000 খ্রিঃ খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে পেশোয়ারের নিকটস্থ কয়েকটি দুর্গ তিনি দখল করেন। — প্রথম অভিযান

(ii) 1001 খ্রিঃ ভারত অভিযানে পাঞ্জাবের শাহী বংশের রাজা জয়পালকে তিনি পরাজিত ও বন্দী করেন।

(iii) 1005- 06 খ্রিঃ মামুদ মুলতানের শাসক আব্দুল ফতে দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরন করেন।

(iv) 1008 খ্রিঃ শাহীরাজ জয়পালের পুত্র আনন্দ পালের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান।

উন্দ এর যুদ্ধে (1008 খ্রিঃ) মামুদ দিল্লী, কনৌজ, আজমীর, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর এর রাজাদের সাথে শাহীরাজ আনন্দপালের

যুগ্ম বাহিনীকে পরাস্ত করেন। দুর্গ ভীমনগর মামুদের অধিকারে আসে।

(v) 1009 খ্রি: মামুদ রাজস্থানের নারায়নপুরে অভিযান প্রেরণ করেন ও সফল হন।

(vi) 1010 খ্রি: মুলতানের রাজা দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। (অষ্টম ভারত অভিযান)

(vii) 1012 খ্রি: থানেশ্বর আক্রমণ করে লুন্ঠন চালান।

(viii) 1013 খ্রি: মামুদের বাহিনী শাহীরাজ্য আক্রমণ করে এবং রাজধানী নন্দন সহ রাজ্যের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চল মামুদের অধিকারে আসে। (দশম)

(ix) 1018 খ্রি: মামুদ মথুরা আক্রমণ করেন।

(x) 1018 খ্রি: মামুদ কনৌজ নগরী বিধ্বস্ত করেন।

(xi) 1019 খ্রি: চান্দেল্ল রাজ্যে অভিযান পাঠান। চান্দেল্ল রাজ বিদ্যাধর এর সাথে শাহীরাজ ত্রিলোচনপাল ও তার পুত্র ভীমপাল জোটবদ্ধ হন। ~~কিন্তু~~ কিন্তু মামুদ তাদের পরাস্ত করেন ও সমগ্র হিন্দু শাহী রাজ্য মামুদের অধিকারে আসে। (ত্রয়োদশ ভারত অভিযান)

(xii) 1021 খ্রি: গোয়ালিয়র দুর্গ ~~দখল~~ অবরোধ করেন।

(xiii) 1022 খ্রি: কালিঞ্জর দুর্গ দখল করেন।

(xiv) 1025-26 খ্রি: মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন ও লুন্ঠন কার্য চালান।

(xv) 1027 খ্রি: মামুদ শেষ ভারত অভিযান করেন জাঠদের বিরুদ্ধে।

মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান

গজনীর সুলতান মামুদের ভারতে অভিযানের সমাপ্তির প্রায় দেড়শো বছর পর গজনীর ঘুর বংশের শাসক মহম্মদ ঘোরী (প্রকৃত নাম মুইজউদ্দিন)র নেতৃত্বে তুর্কিরা ভারত অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে তুর্কিরা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল।

সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আলোচ্য সময়কালে ভারতে শাসনরত রাজপুত বংশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল শাকম্ভরী (বর্তমান সম্ভর, জয়পুর)-র চৌহানরা। উত্তরে পুষ্কর থেকে দক্ষিণে আজমীর এবং পূর্বে জয়পুর থেকে পশ্চিমে যোধপুর পর্যন্ত চৌহানদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শেষদিকে আজমীর ছিল তাঁদের প্রধান শাসনকেন্দ্র। তাই সাধারণভাবে একে দিল্লি-আজমীরের চৌহান বংশই বলা হয়ে থাকে। তুর্কি আক্রমণের সময় এই বংশের শাসকদ্বয় হলেন সোমেশ্বর (আঃ ১১৬৯-১১৭৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং তৃতীয় পৃথ্বীরাজ বা পৃথ্বীরাজ চৌহান (১১৭৭-১১৯১ খ্রিস্টাব্দ)। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষদিক থেকেই কনৌজকে কেন্দ্র করে গাহড়বাল নামে একটি রাজপুত রাজ্য উত্তর ভারতে শাসন শুরু করেছিল। দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে শাসন করছিলেন বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্র। চৌহান ও গাহড়বাল—এই দুই রাজপুত রাজ্যের মধ্যে অবশ্য সুসম্পর্ক

ছিল না। আলোচ্য পর্বে উত্তর ভারতে শাসন করত বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল নামে আর একটি রাজপুত রাজ্য। চৌহান বংশের সঙ্গে এই বংশের রাজাদেরও সম্পর্ক ভালো ছিল না।

ঐ তিনটি রাজপুত শক্তি ছাড়াও উত্তর ভারতে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল গুজরাটের চালুক্যরা। ঐ বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক দ্বিতীয় ভীম (আঃ ১১৭৮-১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ) দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে মুসলিম অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আলোচ্য পর্বে মালবে শাসন করছিলেন পরমার বংশের শাসকেরা এবং মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের সময় সেখানের শাসক ছিলেন বিন্ধ্যবর্মণ। চালুক্যদের সঙ্গে পরমারদের কোনো সদ্ভাব ছিল না। প্রায়শই সংঘাত লেগে থাকত। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের অল্পকাল পরেই বিন্ধ্যবর্মণের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পুত্র সুভট্টবর্মণ গুজরাটের চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হন। এই সময় উত্তর ভারতের আর একটি রাজনৈতিক শক্তি হল মেবারের গুহিলরা। তবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে এঁরা খুব শক্তিশালী ছিলেন না। মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের সময় এখানের শাসক ছিলেন যথাক্রমে কুমার সিংহ ও মথন সিংহ। তাঁর অভিযানের সময় বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৭৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ পর্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু—এই তিনটি রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এই রাজ্যগুলি তখন আর গজনীর প্রতি অনুগত ছিল না—স্বাধীনভাবে স্থানীয় মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক এগুলি শাসিত হত। এই রাজ্যগুলির শাসকরা অবশ্য খুব বেশি শক্তিধর ছিলেন না। মহম্মদ ঘোরীর ভারতে অভিযান প্রেরণের সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন খসরু মালিক নামে বিলাসপ্রিয় এক ব্যক্তি। মুলতান শাসিত হচ্ছিল স্থানীয় কারমাতীয় বংশ এবং রাজধানী দেবলকে কেন্দ্র করে সিন্ধু শাসিত হচ্ছিল সুমরাস নামে একটি মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক। পাঞ্জাবের ন্যায় এই রাজ্য দুটিও বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলিম রাজ্যগুলিকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে কোনো বড় ধরনের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। এমনকি প্রতিবেশী রাজপুত শক্তিগুলিও প্রায় নিশ্চেষ্ট ছিল।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যে-উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে মামুদ বারবার এদেশে অভিযান চালিয়েছিলেন সেই সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি ভারতীয় শাসকদের তরফে। দিল্লি ও আজমীরের চৌহান, কনৌজের গাহড়বাল, গুজরাটের চালুক্য, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্ল, মালবের পরমার প্রভৃতি রাজনৈতিক শক্তিগুলি বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো প্রচেষ্টা না নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। বলাবাহুল্য, এর ফলে এই পর্বের তুর্কি আক্রমণের পথ সহজতর হয়েছিল।

অভিযানের বিবরণ

অনুকূল পরিস্থিতির সুবাদে মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে ভারতে প্রথম অভিযান প্রেরিত হয় ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুলতান ও সংলগ্ন উছ-এর বিরুদ্ধে। সেখানে শাসনরত কারমাতীয় বংশের শাসকদের পরাজিত করে তিনি সেগুলি দখল করে নেন। শুধু তাই নয়, সেখানে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি দক্ষ শাসনব্যবস্থার পত্তন ঘটান।

মুলতানকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে মহম্মদ ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের চালুক্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। রাজধানী অনহিলওয়ারা (বর্তমান পাটন) আক্রান্ত হয়। কিন্তু তাঁর এই অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় মূলরাজের অভূতপূর্ব সাহসী বাহিনী। ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে তিনি পেশোয়ারে প্রবেশ করেন এবং সেখানের বাহিনীকে পরাস্ত করে পাঞ্জাবের শাসনকর্তার অধীনস্থ পেশোয়ার দখল করে নেন (১১৮০ খ্রিস্টাব্দ) এবং সেখানে একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম লাহোরে অভিযান পাঠান। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেরিত অভিযানের সময় লাহোরের শাসনকর্তা খুসরভ মালিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং লাহোর মহম্মদ ঘোরীর অধিকারে আসে। এর ফলে ভারতের সীমান্তে একদা মামুদ প্রতিষ্ঠিত ইয়ামিনি রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। ইতিমধ্যে ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিন্ধুর রাজধানী দেবল আক্রমণ করেন এবং সেখানের সুমার বংশীয় শাসকদের তাঁর আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য করেন। এছাড়া, ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে শিয়ালকোট শহর ও দুর্গ সহ পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব অংশ নিজ দখলে আনেন।

অতঃপর খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দশকের একেবারে গোড়ায় অর্থাৎ হাতে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে নিজ ক্ষমতাকে সঞ্জীবিত করে নতুন উদ্যমে মহম্মদ উত্তর ভারতের অন্যতম রাজপুত শক্তি দিল্লি ও আজমীরের চৌহান বংশের তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে মনস্থ করেন। ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি সুশৃঙ্খল সেনাদল সহ গজনী থেকে উত্তর ভারত অভিমুখে বের হন এবং তবরহিন্দ (ভাতিণ্ডা)-য় পৌঁছান। মহম্মদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চৌহানদের অধিকারভুক্ত ভাতিণ্ডা দখল করে নেন এবং ১২০০ (বারশো) অশ্বারোহীর একটি বাহিনী সহ জিয়াউদ্দিন তালকি নামে তাঁর এক অনুচরের ওপর এর ভার ন্যস্ত করেন। দিল্লির তৎকালীন শাসনকর্তা গোবিন্দ রায় (পৃথ্বীরাজ চৌহানের ছোট ভাই) পৃথ্বীরাজকে তাঁর রাজ্যে এই তুর্কি আক্রমণের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজমীর থেকে এক বিরাট সেনাদল পাঠানো হয় ঐ তুর্কি আক্রমণের মোকাবিলার জন্য। ভাতিণ্ডায় তুর্কি অভিযানের প্রতিরোধে এই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গোবিন্দ রায় ও অন্যান্য কয়েকটি রাজপুত শক্তির সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশ। কেবল কনৌজের রাঠোর বংশীয় জয়চাঁদ এই যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিলেন। চৌহান তথা রাজপুত জোট ও তুর্কি—এই দুই প্রতিপক্ষ শক্তির মধ্যে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল দূরে তরাইন (তরোওরি) নামক স্থানে। এটি ইতিহাসে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানের নেতৃত্বে রাজপুত শক্তির কাছে মহম্মদ ঘোরীর বাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়।

রাজপুত শক্তির কাছে মহম্মদ ঘোরী তথা তুর্কি বাহিনীর এই (তরাইনের প্রথম যুদ্ধে) পরাজয় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিদেশীয় আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয়দের সাফল্যের নজীর খুবই কম। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পৃথ্বীরাজ দিতে পারেননি।

মহম্মদ ঘোরী তথা তুর্কি বাহিনীর ক্ষমতার পূর্ণ বিনাশ না ঘটানোর বিষময় ফল অবশ্য লক্ষ করা গিয়েছিল অনতিবিলম্বেই। এরই ফলস্বরূপ পরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ও রাজপুত—পরস্পরবিরোধী এই দুটি সেনাবাহিনী সরস্বতী নদীর তীরে তরাইনে দ্বিতীয় বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পৃথ্বীরাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশাল সংখ্যক সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো সত্ত্বেও যুদ্ধ চলাকালীন মহম্মদ ঘোরী রাজপুত বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দেন—তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। প্রায় একলক্ষ রাজপুত সেনা নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধে যোগদানকারী দিল্লির প্রধান গোবিন্দ রায় নিহত হন। আহত পৃথ্বীরাজকে বন্দি করা হয় এবং এরপর তিনি মারা যান। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহম্মদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হান্সি, সুরসুতি (সরস্বতী), কুহ্‌রাম, সামানা দখল করে নেন এবং বেশকিছু মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস করেন। চৌহানদের প্রধান শাসনকেন্দ্র আজমীরে প্রথমে তুর্কিদের কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে বসানো হয় এবং পরে তা মহম্মদ ঘোরী দখল করে নেন। অনুরূপভাবে, মহম্মদের অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবকের ওপর দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থে একটি তুর্কি বাহিনীর দায়িত্বভার দেওয়া হয় এবং অল্পকালের মধ্যে তা তুর্কিদের দখলে চলে আসে।

চৌহান বংশের পতনের পর মহম্মদ ঘোরী গাহড়বাল বংশের খ্যাতনামা রাজা জয়চন্দ্রকে যমুনা নদীর তীরে চন্দবার ও ইতা'র মধ্যবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত এক যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাস্ত করেন। সতীশ চন্দ্র যথার্থই বলেছেন যে এইভাবে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ও চন্দওয়ারের যুদ্ধ উত্তর ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করল। এর সূত্র ধরে কনৌজ ও বারাণসী মহম্মদ ঘোরীর অধীনে চলে আসে। তাঁর নেতৃত্বে এইভাবে উত্তর ভারতে তুর্কি তথা মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে গজনী প্রত্যাবর্তনের সময় এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন।

তুর্কি শক্তির সাফল্যের কারণ

রাজপুত তথা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তুর্কি তথা আফগান সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত সাফল্য লাভ করে। তুর্কিদের এই সাফল্য তথা উত্তর ভারতের রাজপুত শক্তিসমূহের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। উভয়পক্ষের সামরিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে মধ্য এশিয়ার উন্নতমানের যুদ্ধমান ঘোড়াগুলি ভারতীয় ঘোড়াগুলির তুলনায় সম্মুখ যুদ্ধে অনেক বেশি দক্ষ ছিল। আফগানদের আকস্মিক আক্রমণাত্মক কৌশলও ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া, আফগান তথা তুর্কি বাহিনীর ন্যায় ভারতীয় সেনারা যুদ্ধকে জীবন-মরণ সংগ্রাম হিসাবে মনে করে লড়াই করতে পারেনি। সেনাদলের মধ্যে ঐক্যবোধেরও অভাব ছিল।

বিদেশীয় শত্রুদের আক্রমণের প্রধান রাস্তা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথে প্রতিরক্ষার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সমস্ত ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরীর অভিযানকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য ভারতীয় রাজাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে বড় ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলারও চেষ্টা নেওয়া হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ১১৯৩ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মহম্মদ ঘোরী ও তাঁর অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবক যখন কিছুটা সমস্যার মধ্যে ছিলেন তখন শক্তিশালী ঐক্যজোট গঠন করে ভারতীয়দের

পক্ষে তাদের উত্তর ভারত থেকে অপসারিত করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি।

তুর্কি শক্তির কাছে ভারতীয়দের পরাজয়ের এক সহজ-সরল অথচ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র। তিনি লিখেছেন, "কোনো দেশ যদি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা প্রতিবেশী দেশের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে তাহলেই অন্য দেশ কর্তৃক সেই দেশটি বিজিত হয়।" সমাজে সামন্তপ্রথা ছিল। ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিতদের নানা বিধিবিধানে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেও সমগ্র ভারতব্যাপী সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। কারিগর শ্রেণীর উন্নতি বিধানেও লক্ষণীয় কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সমস্ত কারণেই জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তুর্কি সেনাবাহিনীর কাছে রাজপুত রাজ্যগুলি পরাজিত হতে বাধ্য হয়।

তুর্কি সাফল্যের প্রভাব

ভারতবর্ষের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ তথা মহম্মদ ঘোরীর সামগ্রিক অভিযানের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বস্তুতপক্ষে এর ফলে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আসে। আঞ্চলিক শক্তিগুলির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। এর পরিবর্তে উত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং ক্রমশ তা একটি শক্তিশালী ও অতিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ডি. সি. গাঙ্গুলী যথার্থই বলেছেন যে, দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পরাজয় কেবল চাহমানদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিনাশ ঘটায়নি, এর ফলে সমগ্র হিন্দুস্তানের বিপর্যয় সূচিত হয়েছিল। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি যুগ সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল হবে না। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর জয়লাভ ছিল তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা এরই সূত্র ধরে ১১৯৩ থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে মহম্মদ ঘোরীর পরিকল্পনায় এবং তাঁর অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবকের সহযোগিতায় দিল্লি ও আজমীরকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে মুসলমান তথা তুর্কি শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

উত্তর ভারতের খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো মনে রাখা দরকার যে তুর্কি শাসনের প্রারম্ভিকপর্বে এদেশে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলত সামরিক শাসন। সামরিক দিক থেকে বিচার বিবেচনা করেই তুর্কিরা সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিল, যা 'ইক্তা' নামে পরিচিত। সুতরাং তুর্কিদের জয়লাভের সূত্র ধরে ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে কিছু রদবদল ঘটেছিল তা স্পষ্ট। এছাড়া শাসন কার্যের প্রধান ভাষা হিসাবে পারসিক ভাষার প্রচলন ঘটে। তবে গ্রামাঞ্চলে পূর্বের শাসনব্যবস্থা প্রায় অবিকল ছিল।

আঞ্চলিক ও খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। বেশ কিছু নগর-বন্দর গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুবাদে শুল্ক নির্ধারণ ও মুদ্রা ব্যবস্থাও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের ফলে নগরায়ণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সুগভীর কিছু পরিবর্তন এসেছিল মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের সূত্র ধরে। প্রসঙ্গত বলা যায় তুর্কি শাসনাধীন উত্তর ভারতে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীলোককে আড়ালে রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। শিল্পকলা তথা স্থাপত্য-ভাস্কর্য—আরো স্পষ্ট করে বললে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই অভিযানের প্রভাব পড়েছিল। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, "ভারতীয়দের সুগভীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে সমুন্নত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তুর্কি ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে শেষপর্যন্ত এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।"

মূল্যায়ন

মামুদের ভারত অভিযানের প্রকৃতি ছিল লুণ্ঠনবৃত্তি। কিন্তু মহম্মদ ঘোরীর অভিযান লুণ্ঠনবৃত্তিকে সামনে রেখে সংঘটিত হয়নি। ভারতবর্ষের উত্তরাংশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি দখল করে সেগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং ঘোরী অভিযানের প্রকৃতি ছিল প্রধানত রাজনৈতিক। তাঁর অদম্য মনোবল ও অসাধারণ রণনৈপুণ্যের দরুন তুর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সার্বিক ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন মহম্মদ ঘোরী। তাই সঙ্গত কারণেই তাঁকে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের স্থপতি বা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, উল্লেখ্য, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর এক গোঁড়া মুসলমানের হাতে তিনি নিহত হলে কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বেই তুর্কি শাসন পরিচালিত হতে থাকে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে লুণ্ঠনবৃত্তি নয়, ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ঘোরী অভিযানের প্রকৃতি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বখতিয়ার খলজীর মতো সাহসী সৈনিক (যাঁর নেতৃত্বে বিহার ও বাংলায় আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়েছিল) এবং বিশেষভাবে কুতুবউদ্দিনের মতো বিশ্বস্ত অনুচর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়ক হয়েছিলেন।

মহম্মদ ঘোরীর অভিযানকালে ধ্বংসকার্য যে একেবারে ঘটেনি তা নয়। উল্লেখ্য, তাঁর সাহসী কর্মচারী মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের অভিঘাতে বিহারের বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিহারটি ধ্বংস হয়েছিল। এছাড়া, বহু শতাব্দী ধরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মহামূল্যবান গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল তাও নৃশংসভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ধ্বংসকার্যগুলিকে মামুদের লুণ্ঠনবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা অযৌক্তিক। আসলে ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটানোই ছিল ঘোরী অভিযানের মূল লক্ষ্য।